سورة الملك

সূরা মুল্ক্

মক্কায় অবতীর্ণ, ৩০ আয়াত, ২ রুকু'

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرُ ۙ ۝١ الَّذِىْ
خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ
الْغَفُوْرُ ۝٢ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ۗ مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ
مِنْ تَفٰوُتٍ ۗ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ۝٣ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ
كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ۝٤ وَلَقَدْ زَيَّنَّا
السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ
عَذَابَ السَّعِيْرِ ۝٥ وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ۗ وَبِئْسَ
الْمَصِيْرُ ۝٦ اِذَآ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِىَ تَفُوْرُ ۝٧ تَكَادُ تَمَيَّزُ
مِنَ الْغَيْظِ ۗ كُلَّمَآ اُلْقِىَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ
نَذِيْرٌ ۝٨ قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ ۙ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ
اللّٰهُ مِنْ شَىْءٍ ۖ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ ۝٩ وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ
اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ۝١٠ فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْۢبِهِمْ ۚ
فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ۝١١ اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ
مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝١٢ وَاَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوْا بِهٖ ۗ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ

بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝١٣ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ؕ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ۝١٤ هُوَ
الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ
رِّزْقِهٖ ؕ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ ۝١٥ ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَآءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ
الْاَرْضَ فَاِذَا هِيَ تَمُوْرُ ۝١٦ اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَآءِ اَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ
حَاصِبًا ؕ فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ ۝١٧ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ
فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ۝١٨ اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صٰٓفّٰتٍ وَّيَقْبِضْنَ
ۘ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمٰنُ ؕ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍۭ بَصِيْرٌ ۝١٩ اَمَّنْ هٰذَا
الَّذِيْ هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ ؕ اِنِ الْكٰفِرُوْنَ
اِلَّا فِيْ غُرُوْرٍ ۝٢٠ اَمَّنْ هٰذَا الَّذِيْ يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهٗ ۚ بَلْ
لَّجُّوْا فِيْ عُتُوٍّ وَّ نُفُوْرٍ ۝٢١ اَفَمَنْ يَّمْشِيْ مُكِبًّا عَلٰى وَجْهِهٖٓ اَهْدٰٓى
اَمَّنْ يَّمْشِيْ سَوِيًّا عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝٢٢ قُلْ هُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَكُمْ
وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝٢٣
قُلْ هُوَ الَّذِيْ ذَرَاَكُمْ فِي الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝٢٤ وَيَقُوْلُوْنَ
مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝٢٥ قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۪
وَاِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝٢٦ فَلَمَّا رَاَوْهُ زُلْفَةً سِيْٓـَٔتْ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا وَقِيْلَ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَدَّعُوْنَ ۝٢٧ قُلْ اَرَءَيْتُمْ
اِنْ اَهْلَكَنِيَ اللّٰهُ وَمَنْ مَّعِيَ اَوْ رَحِمَنَا ۙ فَمَنْ يُّجِيْرُ الْكٰفِرِيْنَ مِنْ
عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝٢٨ قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۚ

فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ
اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) পুণ্যময় তিনি, যাঁর হাতে রাজত্ব। তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। (২) যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন----কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাময়। (৩) তিনি সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। তুমি করুণাময় আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে কোন তফাৎ দেখতে পাবে না। আবার দৃষ্টি ফিরাও কোন ফাটল দেখতে পাও কি? (৪) অতঃপর তুমি বারবার তাকিয়ে দেখ--তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও পরিশ্রান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে। (৫) আমি সর্বনিম্ন আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুসজ্জিত করেছি; সেগুলোকে শয়তানদের জন্য ক্ষেপণাস্ত্র করেছি এবং প্রস্তুত করে রেখেছি তাদের জন্য জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি। (৬) যারা তাদের পালনকর্তাকে অস্বীকার করেছে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। সেটা কত নিকৃষ্ট স্থান। (৭) যখন তারা তথায় নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তার উৎক্ষিপ্ত গর্জন শুনতে পাবে। (৮) ক্রোধে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে। যখনই তাতে কোন সম্প্রদায় নিক্ষিপ্ত হবে তখন তাদেরকে তার সিপাহীরা জিজ্ঞাসা করবে: তোমাদের কাছে কি কোন সতর্ককারী আগমন করেনি? (৯) তারা বলবে: হ্যাঁ, আমাদের কাছে সতর্ককারী আগমন করেছিল, অতঃপর আমরা মিথ্যারোপ করেছিলাম এবং বলেছিলাম: আল্লাহ্ কোন কিছু নাযিল করেন নি। তোমরা মহা বিভ্রান্তিতে পড়ে রয়েছ। (১০) তারা আরও বলবে: যদি আমরা শুনতাম অথবা বুদ্ধি খাটাতাম, তবে আমরা জাহান্নামবাসীদের মধ্যে থাকতাম না। (১১) অতঃপর তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। জাহান্নামীরা দূর হোক। (১২) নিশ্চয় যারা তাদের পালনকর্তাকে না দেখে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। (১৩) তোমরা তোমাদের কথা গোপনে বল অথবা প্রকাশ্যে বল, তিনি তো অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক অবগত। (১৪) যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি করে জানবেন না? তিনি সূক্ষ্ম জ্ঞানী সম্যক জ্ঞাত। (১৫) তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সুগম করেছেন, অতএব তোমরা তাঁর কাঁধে বিচরণ কর এবং তাঁর দেয়া রিযিক আহার কর। তাঁরই কাছে পুনরুজ্জীবন হবে। (১৬) তোমরা কি ভাবনামুক্ত হয়ে গেছ যে, আকাশে যিনি আছেন, তিনি তোমাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দেবেন, অতঃপর কাঁপতে থাকবে। (১৭) না, তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে গেছ যে আকাশে যিনি আছেন, তিনি তোমাদের উপর প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, অতঃপর তোমরা জানতে পারবে কেমন ছিল আমার সতর্কবাণী। (১৮) তাদের পূর্ববর্তীরা মিথ্যারোপ করেছিল, অতঃপর কত কঠোর হয়েছিল আমার অস্বীকৃতি। (১৯) তারা কি লক্ষ্য করে না তাদের মাথার উপর উড়ন্ত পক্ষীকুলের প্রতি---পাখা বিস্তারকারী ও পাখা সংকোচনকারী? রহমান আল্লাহ্-ই তাদেরকে স্থির রাখেন। তিনি সর্ববিষয় দেখেন। (২০) রহমান আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন

সৈন্য আছে কি, যে তোমাদেরকে সাহায্য করবে? কাফিররা বিভ্রান্তিতেই পতিত আছে। (২১) তিনি যদি রিযিক বন্ধ করে দেন, তবে কে আছে, যে তোমাদেরকে রিযিক দেবে? বরং তারা অবাধ্যতা ও বিমুখতায় ডুবে রয়েছে। (২২) যে ব্যক্তি উপুড় হয়ে মুখে ভর দিয়ে চলে, সে-ই কি সৎ পথে চলে, না সেই ব্যক্তি যে সোজা হয়ে সরল পথে চলে? (২৩) বলুন, তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং দিয়েছেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর। তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর (২৪) বলুন, তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে বিস্তৃত করেছেন এবং তাঁরই কাছে তোমরা সমবেত হবে। (২৫) কাফিররা বলেঃ এই প্রতিশ্রুতি কবে হবে। যদি তোমরা সত্যবাদী হও? (২৬) বলুন, এর জ্ঞান আল্লাহ্‌র কাছেই আছে। আমি তো কেবল প্রকাশ্য সতর্ককারী। (২৭) যখন তারা সেই প্রতিশ্রুতিকে আসন্ন দেখবে তখন কাফিরদের মুখমণ্ডল মলিন হয়ে পড়বে এবং বলা হবেঃ এটাই তো তোমরা চাইতে। (২৮) বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ--যদি আল্লাহ্ আমাকে ও আমার সংগীদেরকে ধ্বংস করেন অথবা আমাদের প্রতি দয়া করেন, তবে কাফিরদেরকে কে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? (২৯) বলুন, তিনি পরম করুণাময়, আমরা তাতে বিশ্বাস রাখি এবং তারই উপর ভরসা করি। সত্বরই তোমরা জানতে পারবে কে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় আছে। (৩০) বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি যদি তোমাদের পানি ভূগর্ভের গভীরে চলে যায় তবে কে তোমাদেরকে সরবরাহ করবে পানির স্রোতধারা।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

পুণ্যময় (আল্লাহ্) তিনি, যাঁর কব্জায় সমস্ত রাজত্ব। তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন----কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম। (কর্ম সুন্দর হওয়ার মধ্যে মৃত্যুর প্রভাব এই যে, মৃত্যু চিন্তার কারণে মানুষ দুনিয়াকে ধ্বংসশীল এবং কিয়ামতের বিশ্বাসের ফলে পরকালকে অক্ষয় মনে করতে পারে এবং পরকালের সওয়াব অর্জন ও পরকালের শাস্তি থেকে আত্মরক্ষার্থে কর্মতৎপর হতে পারে। জীবনের প্রভাব এই যে, জীবন না হলে কর্ম কখন করবে। অতএব কর্ম সুন্দর হওয়ার জন্য মৃত্যু যেন শর্ত এবং জীবন যেন পাত্র। নিছক না থাকাই যেহেতু মৃত্যু নয়, তাই এটা সৃজিত হতে পারে)। তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাময়। (কাজেই অসুন্দর কর্মের শাস্তি এবং সুন্দর কর্মের জন্য ক্ষমা ও সওয়াব দান করেন)। তিনি সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। (সহীহ্ হাদীসে আছে, এক আকাশের উপরে অনেক দূরত্বে দ্বিতীয় আকাশ অবস্থিত। এমনিভাবে আরও আকাশ রয়েছে। অতঃপর আকাশের মজবুতী বর্ণনা করা হচ্ছে যে হে দর্শক) তুমি আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে কোন তফাৎ দেখতে পাবে না। আবার দৃষ্টিপাত কর--কোন ফাটল দেখতে পাও কি? (অর্থাৎ অগভীর দৃষ্টিতে তো অনেকবার দেখেছ। এবার গভীর দৃষ্টিতে দেখ) অতঃপর তুমি বারবার তাকিয়ে দেখ---তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও পরিশ্রান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে। (কিন্তু কোন চিড় দৃষ্টিগোচর হবে না। সুতরাং আল্লাহ্ যেভাবে ইচ্ছা সৃষ্টি করতে পারেন। আকাশকে এমন মজবুত করে সৃষ্টি

করেছেন যে, দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পরও এতে কোন ত্রুটি দেখা যায় না। মোটকথা তাঁর সব রকম ক্ষমতা আছে। আমার শক্তি-সামর্থ্যের প্রমাণ এই যে) আমি সর্বনিম্ন আকাশকে প্রদীপমালা (অর্থাৎ নক্ষত্ররাজি) দ্বারা সুশোভিত করেছি, এগুলোকে (অর্থাৎ নক্ষত্ররাজিকে) শয়তানের জন্য ক্ষেপণাস্ত্র করেছি (সূরা হাজরে এর স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে) এবং আমি তাদের (অর্থাৎ শয়তানদের) জন্য (দুনিয়ার এই ক্ষেপণাস্ত্র ছাড়া পরকালে কুফরের কারণে) জাহান্নামের শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। যারা তাদের পালনকর্তাকে (অর্থাৎ তাঁর তওহীদ) অস্বীকার করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। সেটা কত নিকৃষ্ট স্থান! যখন তারা তথায় নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তার উৎক্ষিপ্ত গর্জন শুনতে পাবে। ক্রোধে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে। (হয় আল্লাহ্ তার মধ্যে উপলব্ধি ও ক্রোধ সৃষ্টি করে দেবেন, ফলে সে-ও কাফিরদের প্রতি ক্রোধান্বিত হবে, না হয় দৃষ্টান্তস্বরূপ এ কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ যেমন কেউ ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে যায়, তেমনি জাহান্নাম তীব্র উত্তেজনাবশত জোশ মারতে থাকবে)। যখনই তাতে কোন (কাফির) সম্প্রদায় নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তাদেরকে তার রক্ষীরা জিজ্ঞাসা করবে ঃ তোমাদের কাছে কি কোন সতর্ককারী (পয়গম্বর) আগমন করেনি? (যে তোমাদেরকে এই শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করত এবং ফলে তোমরা এ থেকে আত্মরক্ষার উপকরণ সংগ্রহ করতে? এই প্রশ্ন শাসানোর উদ্দেশ্যে করা হবে। অর্থাৎ পয়গম্বর তো অবশ্যই আগমন করেছিল। প্রত্যেক নবাগত সম্প্রদায়কে এই প্রশ্ন করা হবে। কেননা, কুফর ভেদে কাফিরদের সব সম্প্রদায় একের পর এক জাহান্নামে যাবে)। তারা (অপরাধ স্বীকার করে) বলবে ঃ হ্যাঁ, আমাদের কাছে সতর্ককারী (পয়গম্বর) আগমন করেছিল। অতঃপর (দুর্ভাগ্যক্রমে) আমরা মিথ্যারোপ করেছিলাম এবং বলেছিলাম ঃ আল্লাহ্ (বিধি-বিধান ও কিতাব ধরনের) কোন কিছু নাযিল করেন নি। তোমরা বিভ্রান্তিতে পড়ে রয়েছ। তারা (ফেরেশতাদের কাছে) আরও বলবে ঃ যদি আমরা শুনতাম অথবা বুদ্ধি খাটাতাম, তবে আমরা জাহান্নামীদের মধ্যে থাকতাম না। মোটকথা, তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। জাহান্নামীদের প্রতি অভিশাপ। নিশ্চয় যারা তাদের পালনকর্তাকে না দেখে ভয় করে, (ঈমান ও আনুগত্য অবলম্বন করে) তাদের জন্য (নির্ধারিত) রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। তোমরা গোপনে কথা বল অথবা প্রকাশ্যে (তিনি সব জানেন। কেননা) তিনি তো অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কেও সম্যক অবগত। যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি করে জানবেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক জ্ঞাত। এই যুক্তির সারমর্ম এই যে, তিনি প্রত্যেক বস্তুর নিরঙ্কুশ স্রষ্টা। অতএব তোমাদের কর্ম এবং কথাবার্তারও স্রষ্টা। জ্ঞান ব্যতীত কোন বস্তু সৃষ্টি করা যায় না। তাই আল্লাহ্র জন্য প্রত্যেক বস্তুর জ্ঞান অপরিহার্য। এখানে কেবল কথাবার্তা সম্পর্কিত জ্ঞানই উদ্দেশ্য নয়; বরং কর্মও এতে দাখিল আছে। তবে কর্মের তুলনায় কথাবার্তা বেশী বিধায় বিশেষ করে কথাবার্তা উল্লেখ করা হয়েছে। মোটকথা, তিনি সব জানেন এবং প্রত্যেককে উপযুক্ত প্রতিদান দেবেন। তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সুগম করেছেন। (ফলে তোমরা অনায়াসে যত্রতত্র গমনাগমন করতে পার) অতএব তোমরা তার বুকের উপর বিচরণ কর এবং (পৃথিবীতে সৃষ্ট) আল্লাহ্র রিযিক আহার কর (পান কর) এবং (পানাহার করে তাঁকে স্মরণ কর। কেননা) তাঁরই কাছে পুনরুজ্জীবন হবে। (সুতরাং তাঁর নিয়ামতসমূহের শোকর আদায়, যা ঈমান ও আনুগত্য)। তোমরা কি ভাবনামুক্ত হয়ে গেছ যে, যিনি আকাশে

(সর্বময় ক্ষমতা নিয়ে) আছেন, তিনি তোমাদেরকে (কারূনের ন্যায়) ভূগর্ভে বিলীন করে দেবেন, অতঃপর তা কাঁপতে থাকবে (ফলে তোমরা আরও নীচে চলে যাবে এবং ভূমি তোমাদের উপরে এসে যাবে) না তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে গেছ যে, যিনি আকাশে (সর্বময় ক্ষমতা নিয়ে) আছেন, তিনি তোমাদের উপর (আদ সম্প্রদায়ের ন্যায়) ঝন্‌ঝাবায়ু প্রেরণ করবেন (ফলে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। অর্থাৎ তোমাদের কুফরের উপযুক্ত শাস্তি এটাই)। অতএব (কোন উপযোগিতাবশত দুনিয়ার শাস্তি টলে গেলেই কি) সত্বরই (মৃত্যুর পরই) তোমরা জানতে পারবে (আযাব থেকে) আমার সতর্কবাণী কেমন (নির্ভুল) ছিল। (যদি দুনিয়ার শাস্তি ব্যক্তি ব্যতীত তারা কুফরের অপকারিতা বুঝতে সক্ষম না হয়, তবে এর নমুনাও বিদ্যমান আছে। সেমতে) তাদের পূর্ববর্তীরা (সত্য ধর্মের প্রতি) মিথ্যা আরোপ করেছিল। অতএব (দেখে নাও তাদের প্রতি) আমার শাস্তি কেমন হয়েছিল। (এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, কুফর গর্হিত। সুতরাং কোন কারণে দুনিয়াতে শাস্তি না হলেও পরজগতে শাস্তি হবে। خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ আয়াতে আকাশ সম্পর্কিত তওহীদের প্রমাণাদি বর্ণিত হয়েছে এবং هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ আয়াতে পৃথিবী সম্পর্কিত প্রমাণাদি ব্যক্ত হয়েছে। অতঃপর শূন্যমণ্ডল সম্পর্কিত প্রমাণাদি ব্যক্ত করা হচ্ছে ঃ) তারা কি লক্ষ্য করে না তাদের মাথার উপর উড়ন্ত পক্ষীকুলের প্রতি---পাখা বিস্তারকারী ও পাখা সংকোচনকারী? (উভয় অবস্থাতে ভারী ও ওজনবিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও আকাশ এবং পৃথিবীর মধ্যবর্তী শূন্যমণ্ডলে অবাধে বিচরণ করে---মাটিতে পতিত হয় না)। দয়াময় আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ তাদেরকে স্থির রাখে না। তিনি সবকিছু দেখেন। (যেভাবে ইচ্ছা পরিচালনা করেন। আল্লাহ্‌র ক্ষমতা তো শুনলে, এখন বল) রহমান আল্লাহ্ ব্যতীত কে তোমাদের সৈন্য-বাহিনী হয়ে (বিপদাপদ থেকে) তোমাদেরকে রক্ষা করবে? কাফিররা (যারা তাদের উপাস্য সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষণ করে তারা) তো নিরেট বিভ্রান্তিতে পতিত রয়েছে। (আরও বল) তিনি যদি রিযিক বন্ধ করে দেন, তবে কে আছে, যে তোমাদেরকে রিযিক দেবে? (কিন্তু তারা এতেও প্রভাবান্বিত হয় না) বরং তারা অবাধ্যতা ও (সত্যের প্রতি) বিমুখতায় ডুবে রয়েছে। (সারকথা এই যে, তোমাদের মিথ্যা উপাস্যরা কোন অনিষ্ট দূর করতে সক্ষম নয়, ينصركم আয়াতে তাই বলা হয়েছে এবং কোন উপকার পৌঁছাতেও সমর্থ নয়, يرزقكم আয়াতে তাই ব্যক্ত করা হয়েছে। এমতাবস্থায় তাদের আরাধনা করা নিরেট বোকামী। উপরে বর্ণিত কাফিরদের অবস্থা শুনে এখন চিন্তা কর যে) যে ব্যক্তি (অসমতল রাস্তার কারণে হোঁচট খেয়ে খেয়ে) উপুড় হয়ে মুখে ভর দিয়ে চলে, সে-ই কি গন্তব্যস্থলে পৌঁছবে, না সে ব্যক্তি, যে সোজা হয়ে সমতল সড়কে চলে? (মু'মিন ও কাফিরের অবস্থা তদ্রূপই। মু'মিনের চলার পথ সরল ধর্ম এবং সে চলেও সোজা হয়ে স্বল্পতা ও বাহুল্য থেকে আত্মরক্ষা করে। পক্ষান্তরে কাফিরের চলার পথ বক্রতা এবং পথভ্রষ্টতাপূর্ণ এবং চলার মধ্যেও সর্বদা বিপদাপদে পতিত হয়। এমতাবস্থায়

সে গন্তব্যস্থলে কিরূপে পৌঁছবে ? উপরে তওহীদের জগত সম্পর্কিত প্রমাণাদি বর্ণিত হয়েছে, অতঃপর আত্মা সম্পর্কিত প্রমাণাদি বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ) বলুন, তিনিই (এমন সক্ষম ও নিয়ামতদাতা যিনি) তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর দিয়েছেন (কিন্তু) তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (আরও) বলুন, তিনিই তোমা-দেরকে পৃথিবীতে বিস্তৃত করেছেন এবং (কিয়ামতের দিন) তোমরা তাঁরই কাছে সমবেত হবে। কাফিররা (যখন কিয়ামতের কথা শুনে, তখন) বলে ঃ এই প্রতিশ্রুতি কবে হবে, যদি তোমরা (অর্থাৎ পয়গম্বর ও তাঁর অনুসারীরা) সত্যবাদী হও, (তবে বল) বলুন ঃ এর (নির্দিষ্ট) জ্ঞান আল্লাহ্‌র কাছেই আছে। আমি তো কেবল (সংক্ষেপে কিন্তু) প্রকাশ্য সতর্ককারী। অতঃপর যখন তারা একে (অর্থাৎ কিয়ামতের আযাবকে) আসন্ন দেখবে, তখন (দুঃখাতিশয্যে) কাফিরদের মুখমণ্ডল ম্লান হয়ে পড়বে (অন্য আয়াতে আছে, وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ) এবং (তাদেরকে বলা হবে ঃ এটাই তো তোমরা চাইতে। [তোমরা বলতে আযাব আন, আযাব আন। কাফিররা তওহীদ, পুনরুত্থান ইত্যাদি বিষয়বস্তু শুনে এমন কথাবার্তা বলত, যা ছিল প্রকারান্তরে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মৃত্যু কামনা এবং তাঁকে পথভ্রষ্ট বলে আখ্যায়িত করা । তাই অতঃপর এর জওয়াব শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। এতে কাফিরদের আযাব এবং অন্যান্য বিষয়বস্তুও সংযুক্ত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ] বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ--যদি আল্লাহ্ আমাকে ও আমার সংগীদেরকে (তোমাদের কামনা অনুযায়ী) ধ্বংস করেন অথবা (আমাদের আশা ও স্বীয় ওয়াদা অনুযায়ী) আমাদের প্রতি দয়া করেন, তবে (তোমাদের কি, তোমরা তো কাফিরই এবং) কাফির-দেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে কে রক্ষা করবে ? (অর্থাৎ আমাদের যা হবে, দুনিয়াতে হবে এবং এর পরিণাম সর্বাবস্থায় শুভ। কিন্তু তোমরা নিজেদের ব্যাপারে চিন্তা কর। তোমাদের দিকে যে মহাবিপদ এগিয়ে আসছে তাকে কে প্রতিরোধ করবে ? আমাদের পার্থিব বিপদাপদ দ্বারা তোমাদের সেই মহাবিপদ টলে যাবে না। অতএব নিজের চিন্তা ছেড়ে আমাদের বিপদ কামনা করা অনর্থক বৈ নয়। আপনি তাদেরকে আরও) বলুন, তিনি আমাদের প্রতি করুণাময়, আমরা (তাঁর আদেশ অনুযায়ী) তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখি এবং তাঁরই উপর ভরসা করি। (সুতরাং ঈমানের বরকতে তিনি আমাদেরকে পরকালের আযাব থেকে মুক্তি দেবেন এবং ভরসার বরকতে তিনি আমাদেরকে পার্থিব বিপদাপদ থেকে বাঁচাবেন অথবা সহজ করে দেবেন। অতএব সত্বরই তোমরা জানতে পারবে (যখন নিজেদেরকে আযাবে পতিত এবং আমাদেরকে মুক্ত দেখবে) প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় কে লিপ্ত আছে ? (অর্থাৎ তোমরাই আছ না আমরা আছি। উপরে বলা হয়েছে যে, কাফিরদেরকে যন্ত্রণা-দায়ক শাস্তি থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। যদি কাফিররা মনে করে যে, তাদের মিথ্যা উপাস্য তাদেরকে রক্ষা করবে, তবে এই ধারণার নিরসনকল্পে আপনি) বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি তোমাদের (কূপের) পানি নিম্নে (নেমে) অদৃশ্যই হয়ে যায়, তবে কে তোমাদেরকে সরবরাহ করবে স্রোতের পানি (অর্থাৎ কে কূপে স্রোত প্রবাহিত করবে এবং ভূগর্ভের গভীর থেকে পানি উপরে আনবে। কেউ যদি খনন করার স্পর্ধা দেখায়, তবে আল্লাহ্ তা'আলা পানি আরও নীচে গায়েব করে দিতে সক্ষম। যখন

আল্লাহ্‌র মুকাবিলায় এতটুকু করতেও কেউ সক্ষম নয়, তখন পরকালে আযাব থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে কিরূপে)?

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা মুলকের ফযীলতঃ এই সূরাকে হাদীসে ওয়াকিয়া ও মুনজিয়া বলা হয়েছে। 'ওয়াকিয়া' শব্দের অর্থ রক্ষাকারী এবং 'মুনজিয়া' শব্দের অর্থ মুক্তিদানকারী। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ هى المانعة المنجية تنجيه من عذاب القبر অর্থাৎ এই সূরা আযাব রোধ করে এবং আযাব থেকে মুক্তি দেয়। যে এই সূরা পাঠ করে, তাকে এই সূরা কবরের আযাব থেকে রক্ষা করবে।---(কুরতুবী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমার আন্তরিক বাসনা এই যে, সূরা মুলক প্রত্যেক মু'মিনের অন্তরে থাকুক। হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতক্রমে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্‌র কিতাবে একটি সূরা আছে, যার আয়াত তো মাত্র ত্রিশটি কিন্তু কিয়ামতের দিন এই সূরা এক এক ব্যক্তির পক্ষে সুপারিশ করবে এবং তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে দাখিল করবে সেটা সূরা মুলক। ---(কুরতুবী)

تَبَارَكَ ـــ تَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

শব্দটি بركت থেকে উদ্ভূত। এর শাব্দিক অর্থ বেশী হওয়া। এই শব্দটি আল্লাহ্‌র শানে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হয় সর্বোচ্চ ও মহান। بِيَدِهِ الْمُلْكُ ---আল্লাহ্‌র হাতে রয়েছে রাজত্ব। কোরআন পাকের স্থানে স্থানে আল্লাহ্‌র জন্য হাত অর্থে يد শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বহু ঊর্ধ্বে। তাই এটা একটা متشابه শব্দ। একে সত্য বলে বিশ্বাস করা ওয়াজিব। কিন্তু এর অবস্থা ও স্বরূপ কারও জানার বিষয় নয়। এর পিছনে পড়া অবৈধ। রাজত্ব বলে আকাশ ও পৃথিবী এবং ইহকাল ও পরকালের রাজত্ব বোঝানো হয়েছে। আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার জন্য চারটি গুণ দাবী করা হয়েছে। এক. তিনি বিদ্যমান আছেন, দুই. তিনি চরম পূর্ণত্ব গুণের অধিকারী এবং সবার ঊর্ধ্বে, তিন. তাঁর রাজত্ব আকাশ ও পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত এবং চার. তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। পরবর্তী আয়াতসমূহে এই দাবীর যুক্তি-প্রমাণ রয়েছে, যা আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীবের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করলেই ফুটে উঠে। তাই পরের আয়াতসমূহে সমগ্র সৃষ্ট জগৎ ও সৃষ্ট বস্তুর বিভিন্ন প্রকার দ্বারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, তওহীদ এবং তাঁর জ্ঞান ও শক্তিমত্তা সপ্রমাণ করা হয়েছে। সর্বপ্রথম সৃষ্টির সেরা মানুষের অস্তিত্বে আল্লাহ্‌র কুদরতের যেসব নিদর্শন রয়েছে, সেগুলোর প্রতি দৃষ্টি করে বলা হয়েছে ঃ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ ---এরপর

কয়েক আয়াতে আকাশ সৃষ্টিতে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে প্রমাণ এনে বলা হয়েছে : اَلَّذِىْ

خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ---এরপর هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا থেকে দুই আয়াতে পৃথিবী সৃজন ও তার উপকারিতা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা বর্ণিত হয়েছে। অবশেষে শূন্যমণ্ডলে বসবাসকারী সৃষ্ট জীব পক্ষীদের উল্লেখ করে اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ বলা হয়েছে। মোটকথা, সমগ্র সূরার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব, জ্ঞান-গরিমা ও শক্তি-সামর্থ্যের পক্ষে প্রমাণাদি উপস্থাপিত করা। প্রসঙ্গক্রমে কাফিরদের শাস্তি, মু'মিনদের প্রতিদান ইত্যাদি বিষয়বস্তুও বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার পূর্ণ জ্ঞান ও শক্তির যেসব প্রমাণ মানুষের মধ্যে রয়েছে দুইটি শব্দের মাধ্যমে সেগুলো নির্দেশ করা হয়েছে।

মরণ ও জীবনের স্বরূপ : خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ---অর্থাৎ তিনি মরণ ও জীবন সৃষ্টি করেছেন। মানুষের অবস্থাসমূহের মধ্যে এখানে কেবল মরণ ও জীবন এই দুইটি অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা, এই দুইটি অবস্থাই মানব জীবনের যাবতীয় হাল ও ক্রিয়াকর্মে পরিব্যাপ্ত। জীবন একটি অস্তিবাচক বিষয় বিধায় এর জন্য 'সৃষ্টি' শব্দ যথার্থই প্রযোজ্য। কিন্তু মৃত্যু বাহ্যত নাস্তিবাচক বিষয়। অতএব একে সৃষ্টি করার মানে কি? এই প্রশ্নের জওয়াবে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। সর্বাধিক স্পষ্ট উক্তি এই যে, মৃত্যু নিরেট নাস্তিকে বলা হয় না; বরং মৃত্যুর সংজ্ঞা হচ্ছে আত্মা ও দেহের সম্পর্ক ছিন্ন করে আত্মাকে অন্যত্র স্থানান্তর করা। এটা অস্তিবাচক বিষয়। মোটকথা, জীবন যেমন দেহের একটি অবস্থার নাম, মৃত্যুও তেমনি একটি অবস্থা। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) ও অন্য কয়েকজন তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে যে, মরণ ও জীবন দুইটি শরীরী সৃষ্টি। মরণ একটি ভেড়ার আকারে এবং জীবন একটি ঘোটকীর আকারে বিদ্যমান আছে। বাহ্যত একটি সহীহ্ হাদীসের সাথে সুর মিলিয়ে এই উক্তি করা হয়েছে। হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন যখন জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে দাখিল হয়ে যাবে, তখন মৃত্যুকে একটি ভেড়ার আকারে উপস্থিত করা হবে এবং পুলসিরাতের সন্নিকটে যবাই করে ঘোষণা করা হবে : এখন যে যে অবস্থায় আছে অনন্তকাল সেই অবস্থায়ই থাকবে। এখন থেকে কারও মৃত্যু হবে না। কিন্তু এই হাদীস থেকে দুনিয়াতে মৃত্যুর শরীরী হওয়া জরুরী হয় না; বরং এর অর্থ এই যে, দুনিয়ার অনেক অবস্থা ও কর্ম যেমন কিয়ামতের দিন শরীরী ও সাকার হয়ে যাবে, যা অনেক সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, তেমনি মানুষের মৃত্যুরূপী অবস্থাও কিয়ামতে শরীরী হয়ে ভেড়ার আকার ধারণ করবে এবং তাকে যবাই করা হবে।---(কুরতুবী)

তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, মৃত্যু নাস্তি হলেও নিরেট নাস্তি নয়; বরং এমন বস্তুর নাস্তি, যা কোন সময় অস্তি লাভ করবে। এ ধরনের সকল নাস্তিবাচক বিষয়ের আকার

জড় অস্তিত্ব লাভের পূর্বে 'আলমে মিছালে' (সাদৃশ্য জগতে) বিদ্যমান থাকে। এগুলোকে 'আ'য়ানে সাবেতা' তথা প্রতিষ্ঠিত বস্তুনিচয় বলা হয়। এসব আকারের কারণে এগুলোর অস্তিত্ব লাভের পূর্বেও এক প্রকার অস্তিত্ব আছে। এরপর তফসীরে মাযহারীতে 'আলমে মিছাল' সপ্রমাণ করার উদ্দেশ্যে অনেক হাদীস থেকে প্রমাণাদি বর্ণনা করা হয়েছে।

মরণ ও জীবনের বিভিন্ন স্তর ঃ তফসীরে মাযহারীতে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অপার শক্তি ও প্রজ্ঞা দ্বারা সৃষ্টিকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেককে এক প্রকার জীবন দান করেছেন। সর্বাধিক পরিপূর্ণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন মানবকে দান করা হয়েছে। এতে একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলীর পরিচয় লাভ করার যোগ্যতাও নিহিত রেখেছেন। এই পরিচয়ই মানুষকে আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধের অধীন করার ভিত্তি এবং এই পরিচয়ই সেই আমানতের গুরুভার, যা বহন করতে আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালা অক্ষমতা প্রকাশ করে এবং মানব আল্লাহ্ প্রদত্ত যোগ্যতার কারণে বহন করতে সক্ষম হয়। এই জীবনের বিপরীতে আসে সেই মৃত্যু, যার উল্লেখ কোরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াতে রয়েছে।

أَفَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ —অর্থাৎ কাফিরকে মৃত এবং মু'মিনকে জীবিত আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কারণ, কাফির তার উপরোক্ত পরিচয় বিনষ্ট করে দিয়েছে। সৃষ্টির কোন কোন প্রকারের মধ্যে জীবনের এই স্তর নেই, কিন্তু চেতনা ও গতিশীলতা বিদ্যমান আছে। এই জীবনের বিপরীতে আসে সেই মৃত্যু, যার উল্লেখ নিম্নোক্ত আয়াতে আছে ঃ

كُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ —এখানে জীবনের অর্থ অনুভূতি ও গতিশীলতা এবং মৃত্যুর অর্থ তা নিঃশেষ হয়ে যাওয়া। কোন কোন সৃষ্টির মধ্যে এই অনুভূতি ও গতিশীলতাও নেই, কেবল বৃদ্ধি পাওয়ার যোগ্যতা আছে, ; যেমন সাধারণ বৃক্ষ ও উদ্ভিদ এ ধরনের জীবনের অধিকারী। এই জীবনের বিপরীতে আসে সেই মৃত্যু, যার উল্লেখ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا আয়াতে আছে। এই তিন প্রকার জীবন মানব, জন্তু-জানোয়ার ও উদ্ভিদের মধ্যে সীমিত। এগুলো ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর মধ্যে এই প্রকার জীবন নেই। তাই আল্লাহ্ তা'আলা প্রস্তর নির্মিত প্রতিমা সম্পর্কে বলেছেন ঃ

أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ —কিন্তু এতদসত্ত্বেও জড় পদার্থের মধ্যেও আস্তির জন্য অপরিহার্য বিশেষ এক প্রকার জীবন বিদ্যমান আছে। এই জীবনের প্রভাবই কোরআন পাকে ব্যক্ত হয়েছে ঃ

وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ —অর্থাৎ এমন কোন বস্তু নেই, যা আল্লাহ্

তা'আলার প্রশংসা-কীর্তন করে না। উপরোক্ত বর্ণনা থেকে আয়াতে মৃত্যুকে অগ্রে উল্লেখ করার কারণও ফুটে উঠেছে। মূলত মৃত্যুই অগ্রে। অস্তিত্ব লাভ করে---এমন প্রত্যেক বস্তুই পূর্বে মৃত্যুজগতে থাকে। পরে তাকে জীবন দান করা হয়। এ কথাও বলা যায় যে, পরবর্তী لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا আয়াতে মরণ ও জীবন সৃষ্টি করার কারণ মানুষের পরীক্ষা নির্ণয় করা হয়েছে। এই পরীক্ষা জীবনের তুলনায় মৃত্যুর মধ্যে অধিক। কেননা, যে ব্যক্তি নিজের মৃত্যুকে উপস্থিত জ্ঞান করবে, সে নিয়মিত সৎকর্ম সম্পাদনে অধিকতর সচেষ্ট হবে। জীবনের মধ্যেও এই পরীক্ষা আছে। কারণ, জীবনের প্রতি পদক্ষেপে মানুষ এই অভিজ্ঞতা লাভ করতে থাকে যে, সে নিজে অক্ষম এবং আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশক্তিমান। এ অভিজ্ঞতা মানুষকে সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু মৃত্যুচিন্তা কর্ম সংশোধন ও সৎকর্ম সম্পাদনে সর্বাধিক কার্যকর।

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসীর (রা) বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ كفى بالموت واعظا وكفى باليقين غنى অর্থাৎ মৃত্যু উপদেশের জন্য এবং বিশ্বাসই ধনাঢ্যতার জন্য যথেষ্ট।---(তিবরানী) উদ্দেশ্য এই যে, বন্ধু-বান্ধব ও স্বজনদের মৃত্যু প্রত্যক্ষকরণ সবচাইতে বড় উপদেশদাতা। যারা এই দৃশ্য দেখে প্রভাবান্বিত হয় না, অন্য কোন কিছু দ্বারা তাদের প্রভাবান্বিত হওয়া সুদূরপরাহত। আল্লাহ্ যাকে ঈমান ও বিশ্বাসরূপী ধন দান করেছেন, তার সমতুল্য কোন ধনাঢ্য ও অমুখাপেক্ষী নেই। রবী ইবনে আনাস (র) বলেনঃ মৃত্যু মানুষকে সংসারের সাথে সম্পর্কহীন করা ও পরকালের প্রতি আগ্রহান্বিত করার জন্য যথেষ্ট।

اَحْسَنُ عَمَلًا এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, মরণ ও জীবনের সাথে জড়িত মানুষের পরীক্ষা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ আমি দেখতে চাই তোমাদের মধ্যে কার কর্ম ভাল। একথা বলেন নি যে, কার কর্ম বেশী। এ থেকে বোঝা যায় যে, কারও কর্মের পরিমাণ বেশী হওয়া আল্লাহ্র কাছে আকর্ষণীয় ব্যাপার নয়; বরং কর্মটি ভাল, নির্ভুল ও মকবুল হওয়াই ধর্তব্য। এ কারণেই কিয়ামতের দিন মানুষের কর্ম গণনা করা হবে না; বরং ওজন করা হবে। এতে কোন কোন এক কর্মের ওজনই হাজারো কর্ম অপেক্ষা বেশী হবে।

ভাল কর্ম কি? হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেনঃ রসূলুল্লাহ্ (রা) এই আয়াত তিলাওয়াত করে اَحْسَنُ عَمَلًا পর্যন্ত পৌঁছে বললেনঃ সেই ব্যক্তি ভাল কর্মী, যে আল্লাহ্র হারামকৃত বিষয়াদি থেকে সর্বাধিক বেঁচে থাকে এবং আল্লাহ্র আনুগত্য করার জন্য সদাসর্বদা উন্মুখ হয়ে থাকে।---(কুরতুবী)

فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ---এ আয়াত থেকে বাহ্যত জানা যায়

যে, দুনিয়ার মানুষ আকাশকে চোখে দেখতে পারে এবং উপরে যে নীলাভ শূন্যমণ্ডল পরিদৃষ্ট হয়, তাই আকাশ হবে, এটা জরুরী নয়। বরং এটা সম্ভবপর যে, আকাশ আরও অনেক অনেক উপরে অবস্থিত হবে। উপরে যে নীলাভ রঙ দেখা যায়, এটা বায়ু ও শূন্য মণ্ডলের রঙ। দার্শনিকগণ তাই বলে থাকেন। কিন্তু এ থেকে এটাও জরুরী হয় না যে, আকাশ মানুষের দৃষ্টিগোচরই হবে না। এটা সম্ভবপর যে, এই নীলাভ শূন্যমণ্ডল কাঁচের মত স্বচ্ছ হওয়ার কারণে বহু উপরে অবস্থিত আকাশ দেখার পথে অন্তরায় নয়। যদি এ কথা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, পৃথিবীতে থাকা অবস্থায় আকাশকে চোখে দেখা যেতে পারে না, তবে এই আয়াতে দেখার অর্থ হবে চিন্তা-ভাবনা করা।---(বয়ানুল কোরআন)

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ—

مصابيح বলে নক্ষত্ররাজি বোঝানো হয়েছে। নিম্নতম আকাশকে নক্ষত্ররাজি দ্বারা সুশোভিত করার জন্য এটা জরুরী নয় যে, নক্ষত্ররাজি আকাশের গায়ে অথবা তার উপরে সংযুক্ত থাকবে; বরং নক্ষত্ররাজি আকাশের বহু নিম্নে মহাশূন্যে থাকা অবস্থায়ও এই আলোকসজ্জা হতে পারে। আধুনিক গবেষণায় এটাই প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে। নক্ষত্ররাজিকে শয়তান বিতাড়িত করার জন্য অঙ্গার করে দেওয়ার অর্থ এরূপ হতে পারে যে, নক্ষত্ররাজি থেকে কোন আগ্নেয় উপাদান শয়তানদের দিকে নিক্ষেপ করা হয় এবং নক্ষত্ররাজি স্বস্থানেই থেকে যায়। সাধারণ দর্শকের দৃষ্টিতে এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নক্ষত্রের ন্যায় গতিশীল দেখা যায়। তাই একে তারকা খসে যাওয়া এবং আরবীতে انقضاض الكوكب বলে দেওয়া হয়।---(কুরতুবী)

এ থেকে আরও জানা গেল যে, ঐশী সংবাদাদি চুরি করার জন্য শয়তানরা যখন ঊর্ধ্ব গগনে আরোহণ করে, তখন তাদেরকে নক্ষত্ররাজির নীচেই বিতাড়িত করে দেওয়া হয়।---(কুরতুবী) এ পর্যন্ত বিভিন্ন সৃষ্টির মধ্যে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ শক্তির প্রমাণাদি বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ থেকে সাত আয়াত পর্যন্ত কাফিরদের শাস্তি ও অনুগত মু'মিনদের সওয়াব বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর পুনরায় জ্ঞান ও শক্তির বর্ণনা আছে।

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا— ذلول এর শাব্দিক অর্থ বাধ্য ও অনুগত। যে জন্তু আরোহণের সময় ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে না, তাকে ذلول বলা হয়। مناكب শব্দটি منكب-এর বহুবচন। এর অর্থ কাঁধ। যে কোন জন্তুর কাঁধ আরোহণের স্থান নয়; বরং কোমর অথবা ঘাড় আরোহণের জায়গা হয়ে থাকে। যে জন্তু আরোহীর জন্য নিজের কাঁধও পেশ করে দেয়, সে খুবই বাধ্য, অনুগত ও বশীভূত হয়ে থাকে। তাই বলা হয়েছে, আমি ভূপৃষ্ঠকে তোমাদের জন্য এমন বশীভূত করে দিয়েছি

যে, তোমরা তার কাঁধে চড়ে অবাধে বিচরণ করতে পার। আল্লাহ্ তা'আলা ভূপৃষ্ঠকে এমন সুষম করেছেন যে, এটা পানির ন্যায় তরলও নয় এবং রুটি ও কর্দমের ন্যায় চাপ সহযোগে নীচেও নেমে যায় না। ভূপৃষ্ঠ এরূপ হলে তার উপর মানুষের বসবাস সম্ভবপর হত না। এমনিভাবে ভূপৃষ্ঠকে লৌহ ও প্রস্তরের ন্যায় শক্তও করা হয়নি। এরূপ হলে তাতে বৃক্ষ ও শস্য বপন করা যেত না, কূপ ও খাল খনন করা যেত না এবং খনন করে সুউচ্চ অট্টালিকার ভিত্তি স্থাপন করা যেত না। এর সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলা ভূপৃষ্ঠকে স্থিরতা দান করেছেন, যাতে এর উপর দালান-কোঠা স্থির থাকে এবং চলাচলকারীরা হোঁচট না খায়।

وَكُلُوا مِنْ رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ—আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে ভূপৃষ্ঠের আনাচে-কানাচে বিচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, এরপর বলেছেন ঃ আল্লাহ্ প্রদত্ত রিযিক আহার কর। এতে ইঙ্গিত হতে পারে যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ এবং পণ্যদ্রব্যের আমদানী-রফতানী আল্লাহ্ প্রদত্ত রিযিক হাসিল করার দরজা। إِلَيْهِ النُّشُورُ বাক্যে বলা হয়েছে যে, ভূপৃষ্ঠ থেকে পানাহার ও বসবাসের উপকারিতা লাভ করার অনুমতি আছে, কিন্তু মৃত্যু ও পরকাল সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে যেয়ো না, পরিণামে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে। ভূপৃষ্ঠে থাকা অবস্থায় পরকালের প্রস্তুতিতে লেগে থাক। পরবর্তী আয়াতে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, পৃথিবীতে বসবাসরত অবস্থায়ও আল্লাহ্র আযাব আসতে পারে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

ءَأَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ

তোমরা কি এ বিষয়ে ভাবনামুক্ত যে, আকাশে যিনি আছেন, তিনি তোমাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দেবেন এবং ভূগর্ভ তোমাদেরকে গিলে ফেলবে? অর্থাৎ যদিও আল্লাহ্ তা'আলা ভূপৃষ্ঠকে এমন সুষম করেছেন যে, খনন ব্যতীত কেউ এর অভ্যন্তরে যেতে পারে না, কিন্তু তিনি একে এরূপও করে দিতে সক্ষম যে, এই ভূপৃষ্ঠই তার উপরে বসবাসকারীদেরকে গ্রাস করে ফেলবে। পরের আয়াতে অন্য এক প্রকার আযাব সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে।

ءَأَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ

অর্থাৎ তোমরা কি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত যে, আকাশে যিনি আছেন, তিনি তোমাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ করবেন এবং তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন? তখন তোমরা এই সতর্কবাণীর পরিণতি জানতে পারবে। কিন্তু তখন জানা নিষ্ফল হবে। আজ সুস্থ ও নিরাপদ অবস্থায় এ বিষয়ে চিন্তা কর। এরপর দুনিয়াতে আযাবপ্রাপ্ত জাতি-সমূহের ঘটনাবলীর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য তাদের পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ

কর। وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ আয়াতের মর্মার্থ তাই। অতঃপর সূরার মূল বিষয়বস্তুর দিকে প্রত্যাবর্তন করে সৃষ্টির হাল-অবস্থা থেকে আল্লাহ্ তা'আলার তওহীদ, জ্ঞান ও শক্তির পক্ষে প্রমাণ আনা হয়েছে। স্বয়ং মানব-সত্তা, আকাশ, নক্ষত্র, পৃথিবী ইত্যাদির অবস্থা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর শূন্য পরিমণ্ডলে উড়ন্ত পক্ষীকুলের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ—অর্থাৎ তারা কি পক্ষীকুলকে মাথার উপর উড়তে দেখে না, যারা কখনও পাখা বিস্তার করে এবং কখনও সংকুচিত করে। এদের ব্যাপারে চিন্তা কর, এরা ভারী দেহবিশিষ্ট। সাধারণ নিয়মদৃষ্টে ভারী বস্তু উপরে ছাড়া হলে তা মাটিতে পড়ে যাওয়া উচিত। বায়ু সাধারণভাবে তা আটকাতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা পক্ষীকুলকে বায়ুমণ্ডলে স্থির থাকার মত করে সৃষ্টি করেছেন। বাতাসে ভর দেওয়া এবং তাতে সন্তরণ করে বিচরণ করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে পাখা বিস্তার ও সংকোচনের মাধ্যমে বায়ু নিয়ন্ত্রণ করার নৈপুণ্য শিক্ষা দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, বায়ুর মধ্যে এই যোগ্যতা সৃষ্টি করা যেরূপ পাখা তৈরী করা এবং পাখার মাধ্যমে বায়ু নিয়ন্ত্রণ করার নৈপুণ্য শিক্ষা দেওয়া—এগুলো সব আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তিরই ফলশ্রুতি।

এ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকার সৃষ্টির হাল-অবস্থা নিয়ে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব, তওহীদ এবং নজীরবিহীন জ্ঞান ও শক্তির পক্ষে প্রমাণাদি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। যে ব্যক্তি এগুলো নিয়ে সামান্যও চিন্তা-ভাবনা করে, তার জন্য আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। অতঃপর সূরার শেষ পর্যন্ত কাফির ও পাপাচারীদেরকে আল্লাহ্র আযাব সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। প্রথমে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, যদি আল্লাহ্ তা'আলা কোন সম্প্রদায়ের উপর আযাব নাযিল করতে চান, তবে পৃথিবীর কোন শক্তি তার গতিরোধ করতে পারে না। তোমাদের সেনাবাহিনী, সিপাই-সান্ত্রী তোমাদেরকে সেই আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

اَمَّنْ هٰذَا الَّذِىْ هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اِنِ

الْكٰفِرُوْنَ اِلَّا فِىْ غُرُوْرٍ—এরপর সতর্ক করা হয়েছে যে, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ এবং ভূমি থেকে শস্য ও উদ্ভিদ উৎপন্ন করার মাধ্যমে তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার যে রিযিক পাচ্ছ, এটা তোমাদের ব্যক্তিগত জায়গীর নয়; বরং আল্লাহ্র দান ও বখশিস। তিনি তা বন্ধও করে দিতে পারেন। اَمَّنْ هٰذَا الَّذِىْ يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهٗ আয়াতের উদ্দেশ্য তাই। অতঃপর কাফিরদের জন্য পরিতাপ করা হয়েছে, যারা নিজেরাও

আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী সম্পর্কে চিন্তা করে না এবং বর্ণনাকারীর বর্ণনাও শুনে না।

بَلْ لَّجُّوْا فِىْ عُتُوٍّ وَّنُفُوْرٍ—অর্থাৎ তারা অবাধ্যতা ও সত্যবিমুখতায় বেড়েই চলেছে।

অতঃপর কিয়ামতের মাঠে কাফির ও মু'মিনের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, কিয়ামতের মাঠে কাফিররা উপুড় হয়ে মস্তকের উপর ভর দিয়ে চলবে। বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে আছে যে, সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন---কাফিররা মুখে ভর দিয়ে কিরূপে চলবে? রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেনঃ যে আল্লাহ্ তাদেরকে পায়ে ভর দিয়ে চালনা করেছেন, তিনি কি মুখমণ্ডল ও মস্তকের উপর ভর দিয়ে চালাতে সক্ষম নন? নিম্নোক্ত আয়াতে তাই বলা হয়েছেঃ

أَفَمَنْ يَّمْشِىْ مُكِبًّا عَلٰى وَجْهِهٖٓ أَهْدٰٓى أَمَّنْ يَّمْشِىْ سَوِيًّا عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ—অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুখমণ্ডলে ভর দিয়ে চলে, সে বেশী হিদায়তপ্রাপ্ত, না যে সোজা চলে? শেষোক্ত ব্যক্তিই মু'মিন। সে-ই হিদায়ত পেতে পারে। অতঃপর আবার মানব সৃষ্টিতে আল্লাহ্ তা'আলার শক্তি ও জ্ঞানের কতিপয় বিকাশ বর্ণনা করা হয়েছেঃ

قُلْ هُوَ الَّذِىْٓ أَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْـِٕدَةَ ۚ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ—অর্থাৎ আপনি বলুন, আল্লাহ্ তা'আলাই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর বানিয়েছেন, কিন্তু তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না।

কর্ণ, চক্ষু ও অন্তরের বৈশিষ্ট্যঃ আয়াতে মানুষের অঙ্গসমূহের মধ্যে তিনটি অঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলোর উপর জ্ঞান, অনুভূতি ও চেতনা নির্ভরশীল। দার্শনিকগণ জ্ঞান ও অনুভূতির পাঁচটি উপায় বর্ণনা করেছেন। এগুলোকে পঞ্চ ইন্দ্রিয় বলা হয়। এগুলো হচ্ছে শ্রবণ, দর্শন, ঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শ। ঘ্রাণের জন্য নাক আস্বাদনের জন্য জিহ্বা তৈরী করা হয়েছে এবং স্পর্শশক্তি সমস্ত দেহে নিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা শ্রবণ করার জন্য কর্ণ এবং দেখার জন্য চক্ষু সৃষ্টি করেছেন। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্য থেকে মাত্র দু'টি উল্লেখ করেছেন—কর্ণ ও চক্ষু। কারণ এই যে, ঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শের মাধ্যমে খুব কম বিষয়ের জ্ঞান মানুষ অর্জন করতে পারে। মানুষের জানা বিষয়সমূহের বিরাট অংশ শ্রবণ ও দর্শনের মধ্যে সীমিত। এতদুভয়ের মধ্যেও শ্রবণকে অগ্রে আনা হয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, মানুষ সারাজীবনে যেসব বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করে, তন্মধ্যে শোনা বিষয়সমূহের সংখ্যা দেখা বিষয়সমূহের তুলনায় বহুগুণ বেশী। অতএব, মানুষের অধিকাংশ জানা বিষয় এই দুই পথে অর্জিত হয় বিধান এখানে

পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্য থেকে মাত্র দু'টি উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় বস্তু অন্তর হচ্ছে আসল ভিত্তি ও জ্ঞানের কেন্দ্র। কানে শোনা ও চোখে দেখা বিষয়সমূহের জ্ঞানও অন্তরের উপর নির্ভরশীল। অন্তর যে জ্ঞানের কেন্দ্র এর পক্ষে কোরআন পাকের অনেক আয়াত সাক্ষ্য দেয়। এর বিপরীতে দার্শনিকগণ মস্তিষ্ককে জ্ঞানের কেন্দ্র মনে করেন।

এরপর আবার কাফিরদের প্রতি হুঁশিয়ারী ও শাস্তিবাণী বর্ণিত হয়েছে। সূরার উপসংহারে বলা হয়েছে ঃ ঃ তোমরা যারা পৃথিবীতে বসবাস কর, ভূপৃষ্ঠকে খনন করে কূপ তৈরী কর এবং সেই পানি দ্বারা নিজেদের পান ও শস্য উৎপাদনের কাজ কর, তোমরা ভুলে যেয়ো না যে, এগুলো তোমাদের ব্যক্তিগত জায়গীর নয়, আল্লাহ্‌র দান। তিনিই পানি বর্ষণ করেছেন এবং সেই পানিকে বরফের সাগরে পরিণত করে পঁচন রোধ করার জন্য পর্বতশৃঙ্গে রেখে দিয়েছেন। অতঃপর এই বরফকে আস্তে আস্তে গলিয়ে পর্বতের শিরা-উপশিরার পথে ভূগর্ভের অভ্যন্তরে নামিয়ে দিয়েছেন। এরপর কোন পাইপলাইনের সাহায্য ব্যতিরেকে সেই পানিকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছেন। এখন তোমরা যেথা ইচ্ছা মাটি খনন করে পানি বের করতে পার। তিনি এই পানি মৃত্তিকার উপরের স্তরেই রেখে দিয়েছেন যা কয়েক ফুট মাটি খনন করেই বের করা যায়। এটা স্রষ্টার দান। তিনি ইচ্ছা করলে একে নিম্নের স্তরে তোমাদের নাগালের বাইরে নিয়ে যেতে পারেন।

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ -

অর্থাৎ তারা ভেবে দেখুক, তারা যে পানি কূপের মাধ্যমে অনায়াসে বের করে পান করছে, তা যদি ভূগর্ভের গভীরে চলে যায়, তবে কোন্ শক্তি পানির এই স্রোতধারাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে? হাদীসে আছে, এই আয়াত তিলাওয়াত করার পর বলা উচিত الله رب العالمين অর্থাৎ বিশ্ব পালনকর্তা আল্লাহ্ তা'আলাই পুনরায় এই পানি আনতে পারেন— আমাদের শক্তি নেই।